পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ

রতন বিশ্বাস

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	১৯
পুবের আমন্ত্রণ	২৯-২০২
ভুবন মনমোহিনী দার্জিলিঙ	২৯
মেঘের ঘাঘর জড়িয়ে কার্শিয়াং	৯৯
ঝরনার ধারা তিনধরিয়া	১০৪
পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে কালিম্পং	১২২
ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় মংপু	১৪৯
নীল ছবির শৈলশহর শিলঙ	১৭৭
পশ্চিমের আলো	২০৩-২৩৬
ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে : আলমোড়া	২০৩
হৈমন্তীর দিনগুলি : রামগড়	২১৬
ঝিলিমিলি ঝিলম : কাশ্মীর	২২৮
পাহাড়ে রবীন্দ্র অনুরাগী	২৩৭
রবীন্দ্রনাথের পাহাড় ভ্রমণের কালানুক্রমিক বিবরণ	২৫২
সূত্রাবলী	২৬০
গ্রন্থপঞ্জি	২৬৮

প্রস্তাবনা

সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিজীবনের একটা নিবিড় যোগাযোগ থাকে এবং লেখকের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে যোগ থাকে পারিপার্শ্বিকতার। এই পারিপার্শ্বিকতার মূল উপাদান হচ্ছে পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ। কোনো লেখকের যে মানসিকতার কথা আমরা কখনও বলে থাকি, সেই মানসিকতা গড়ে ওঠে জীবনের এই উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে। বস্তুত একজন লেখক জীবিতাবস্থায় যুগপৎ তাঁর পারিবারিক পরিবেশ, যুগ পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সেইসূত্রে তাঁর সাহিত্যের সামগ্রী অর্জন করেন। এ কথা, পৃথিবীর যে কোনো লেখক সম্পর্কে, এমন কী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সাধারণত দেখা যায় দেশ, জাতি ও কালের প্রভাব কোনো না কোনোভাবে কবিমানস বা সাহিত্যিকমানস গঠনে সাহায্য করে। যে দেশে কবি বা সাহিত্যিক জন্মেছেন, তার প্রাকৃতিক ও সহজাত প্রবণতা, যে জাতির মধ্যে তিনি জন্মেছেন তার ভাবাদর্শ, ধর্ম-সংস্কার, সামাজিক রীতি-নীতির কথা, যে কালে তিনি জন্মেছেন তার সাধারণ ভাবধারা, সমস্যা, আশা-আকাঙ্খা প্রভৃতি তাঁর মানস-যন্ত্রে ঢালাই হয়ে যে রূপ গ্রহণ করে, তাই প্রধানত ব্যক্ত হয় তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে। দেশ ও জাতির ভাবধারা, সংস্কার ও আদর্শ যখন একটা বিশেষ কালোপযোগী রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের বৈশিষ্টের দ্বারা চিহ্নিত হয়, তখনি আমরা সেই ভাবধারা, সংস্কার ও আদর্শের যুগপ্রভাব প্রত্যক্ষ করি। এ যুগপ্রভাব অনেক কবিই এড়িয়ে যেতে পারেন না। সেইসব কবিদের বলা হয় যুগপ্রতিনিধি কবি বা যুগ কবি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভিন্নশ্রেণির। বিশ্বজনীনবোধ ও সার্বজনীনতা তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। দেশ, জাতি ও যুগের ঊর্ধ্বে যে সার্বজনীন ভাব, যে বিশ্বজনীন আদর্শ, যে চিরন্তন নীতি ও শাশ্বত সত্য, তারই উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৃষ্টি

প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির সংকীর্ণ ধর্ম সংস্কার, যুক্তিহীন সমাজ ব্যবস্থার উপর রবীন্দ্রনাথের অন্ধভক্তি ছিল না। মনুষ্যত্বের সার্বজনীন মহান আদর্শ ও উচ্চ নীতির কষ্টিপাথরে তিনি দেশ ও জাতির ভাবাদর্শ ও সংস্কার প্রথাকে বিচার করে গ্রহণ করেছেন। যুগ প্রভাব তাঁর কবিচিত্তে আঘাত করে অনুভূতি ও আবেগে রূপান্তরিত হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে বটে, কোনো কোনো সময়ে, কিন্তু ওই যুগ-সমস্যার মধ্যে তাঁর কাব্যসৃষ্টি হয়নি। যুগের মধ্য দিয়ে যুগাতীত অবস্থায় উন্নীত হয়েছে এবং সর্বকালের সর্বমানবের সমস্যা রূপ পরিগ্রহ করেছে।

তাঁর পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, ''আমাদের পরিবার তখন বৃহৎ ছিল। বাড়িটা মস্ত বড়ো, তবু সকলকে ধরত না। মহারানি ভিক্টোরিয়ার জুবিলির সময় একবার নাকি আমাদের বাড়িতে আলোচনা হয় তাঁর পরিবারে লোকসংখ্যা কত। দাদাদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল তাঁর পরিবার বড়ো না আমাদের পরিবার বড়ো। বলু দাদা কাগজ কলম নিয়ে দুই পরিবারের সংখ্যা গুণতি করে মহা-উল্লাসে সবাইকে জানালেন মহারানির পরিবারের সংখ্যা টেনে টুনে মাত্র একশত। মহর্ষির পরিবারের শতাধিক আত্মীয় স্বজন এই একখানা বাড়িতেই বাস করছে। মহর্ষির কাছে ভিক্টোরিয়া হেরে গেলেন।'' এমন এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। আরও উল্লেখ করা যায়, ''পরিবারের কর্তা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য ছিল তাঁর প্রভাব পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের উপর। অথচ তিনি থাকতেন না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলে গিয়েছিলেন পার্কস্ট্রিটের এক ভাড়াটে বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে। আর তাঁর কাছে থাকতেন তাঁর প্রিয় শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। যদিও বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকতেন কিন্তু সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলোও তাঁর আদেশমতই চলত—কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, নির্দেশের অভাবে কোনো শৈথিল্য নেই। তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিলেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর প্রভাব অনুভব করত। তাঁর আদর্শ সমস্ত পরিবারকে এমন অভিভূত করে রেখেছিল যে স্পষ্টভাবে কোনো আদেশ দিতে হত না।...জোড়াসাঁকোর যে বাড়িতে আমরা, মহর্ষির নিজ পরিবারে থাকতুম, সেটা ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্দরমহল। নিজের জন্য পাশেই আর একটা বাড়ি করেছিলেন—সেটা তাঁর বৈঠকখানা। সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় এই ৫ নম্বর বাড়িটা গগনদাদাদের ভাগে পড়ে। গগনদাদা, সমরদাদা ও অবনদাদা তিনভাই মিলে এই বাড়িতে থাকতেন। ...তাঁদের মন ছিল পড়াশুনা ও শিল্পকলার চর্চায়।

তাঁদের কাছে যেমন আসতেন কলকাতার ধনী সম্প্রদায়, তেমনি আসতেন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা।" বাল্যকাল থেকে তাঁরা বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন—মহর্ষির ধর্মনিষ্ঠ আদর্শ, দ্বিজেন্দ্রনাথের একাধারে পাণ্ডিত্য ও সরলতা, সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত আধুনিকতা ও গগনেন্দ্রনাথের বাড়ির শিল্পচর্চার আবহাওয়া। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়, ঠাকুর পরিবারে গান বাজনার পরিবেশের কথা জানা যায়। পারিবারিক পরিবেশ কবির ব্যক্তিজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবেশ ছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির জীবনে লক্ষ করা যায়। তাঁর শৈশব কেটেছে ভৃত্য পরিবৃতে। জমিদার বাড়ির বাইরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ ঘটেনি। কবি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে; ভুলিয়া যায় আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ। কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নেই। সংসারে যে হতভাগ্যশিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে, তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।"

তাঁর কথায় আরও আসা যায়, "ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নেই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত।" প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কী আছে বলো দেখি।" কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।"

প্রকৃতির প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ ও গভীর মমত্ববোধ রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছেলেবেলায় ভৃত্যতান্ত্রিক শাসনের অধীন থেকে প্রকৃতিপরিবেশ হতে দূরে মহানগরীর বহু প্রাচীর বেষ্টিত কষ্টসাধ্য নিরন্তর অবস্থান কবির মনে প্রকৃতির প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর বিহারীলাল প্রবন্ধে (আধুনিক সাহিত্য) বলেছেন, "এই (বিহারীলালের) বর্ণনা পাঠ করে বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের মন হু হু করিয়া উঠিত'...সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের আহ্বান বালক-পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া

উঠিয়াছিল.... যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস মনে হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিয়া থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেইভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।'' ...'যে সোনার কাঠির স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে''— রবীন্দ্রনাথ সেই সোনার কাঠির স্পর্শ প্রথম লাভ করেন বিহারীলালের প্রকৃতি বর্ণনায়। তারপর উপনিষদের প্রভাবে কবির প্রকৃতি প্রেম গভীর ও বৃহৎ হল এবং প্রকৃতিকে কবি নবতর দৃষ্টিতে দেখলেন। একই প্রাণের ধারা প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ায়, কবি প্রকৃতির সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ অনুভব করলেন এবং তার সমস্ত রূপ ও রসে পরম সৌন্দর্যময় ও পরম রসময়কে আস্বাদন করলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বব্যাপক, সর্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপূর্ণ প্রকৃতির কবি বিশ্বসাহিত্যে বোধ- হয় দ্বিতীয়টি নেই। কৈশোর থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও প্রকৃতি তাঁর কাছে পুরোনো হয়নি, সর্বদাই তাঁর চোখে প্রকৃতি অপূর্ব নবীন, রহস্যময়, বিস্ময়ঘন ও বিচিত্র রসমণ্ডিত বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে স্থির সম্বন্ধ স্থাপিত হলেও প্রকৃতির উপর থেকে কোনোদিনই তাঁর মায়াময়, রহস্য মাখা রোমান্টিক দৃষ্টি একেবারে অপসারিত হয়নি। প্রকৃতি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যেন তিলে তিলে নূতন হয়েছে।

প্রমথনাম বিশী 'রবীন্দ্রসরণী' গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, তাঁর জীবনে তিনটি পরিবেশের চিত্র বিদ্যমান। জোড়াসাঁকো, শিলাইদহ এবং শান্তিনিকেতন। সমতল, মাঠ, নদী প্রভৃতি তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তবে পাহাড়ও তাঁকে বার বার আকর্ষণ করেছে। শৈশব থেকে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত পাহাড় তাঁর আশ্রয়। শৈশবে তাঁর পাহাড়ের উপর আকর্ষণ জন্মাবার একটি লক্ষণের কথা এখানে উল্লেখ করি। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, ''গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে, নিতান্তই গাছ বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।''

পাহাড়কে ভালোলাগার উদাহরণ অনেক আছে। এই প্রসঙ্গে ভানুসিংহের পত্রাবলী-১২ সংখ্যাটি (রাণুকে লেখা) উল্লেখ করি। তিনি লিখেছেন, ''তুমি বোধহয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্চ। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার

পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম। তার আগে ভূগোলে পড়েছিলুম, পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিস আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কী যে কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় করেছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেছ,—পাঠানকোট সেইরকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো, "কর, খল" " জল পড়ে, পাতা নড়ে" এর বেশি আর নয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠতে লাগলুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, হিমালয় যত বড়োই হোক না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েচে; মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়! আসল কথা, পাহাড়টা থাকে থাকে উপরে উঠেছে বলে, ডাণ্ডি করে চড়তে চড়তে, পর্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে জিনিসটা খুব বড়ো, আমরা একেবারে তার সমস্তটা তো দেখতে পাই নে—পর্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি, এমনকি, যে মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তার সেই বড়ো বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যে তফাত জিনিসটা কল্পনায় যত বড়ো, প্রত্যক্ষ তত বড়ো নয়। অর্থাৎ বড়ো হলেও বড়ো দেখা যায় না। আমাদের যে ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়ো তার সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সামনে আসত, তাহলে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মতো আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। যতই উঠি না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না,—বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চলতে থাকে। তাই তো তাঁকে বন্ধু বলতে আমাদের কিছু ঠেকে না—তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত উপরে চড়ে যান না-যে, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হয়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের করে নিয়েছে, আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও করতে পারি সাতাশও করতে পারি—আবার সাতাশ কোটি করলেও চলে; তিনি যে আমাদের জন্য সবই হতে পারেন, তা নইলে তাঁকে দিয়ে আমাদের চলতই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগল, আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া পাহাড়ের চেয়ে ভালো পাহাড় ঢের আছে, আলমোড়া ভারি নেড়া পাহাড়; ওর